গোপাদ্রির গোয়ালিয়ার

BANGLADARSHAN.COM

পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥উৎসর্গ॥

গুরুর চরণধূলি নিয়ে
মনমুকুর মালিন্যমুক্ত,
জগন্মাতার মহিমা গাই
সন্তান তাঁর অনুরক্ত।

“সদ্গুরুরূপী ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর পুতরাঙাপাদপদ্মে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হল মাতৃচরণাশ্রীতা পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে জগৎজননীর সতত কৃপা ও অমৃতকরুণাধারা ব্যতীত আমার লেখা সম্ভবই ছিল না।

জয় শ্রীশ্রী মা সর্বাণী, জয় গুরুমহারাজগণ।

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

গল্পের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
গোয়ালিয়রে রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের সমাধি দর্শন– একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি	৪
গোয়ালিয়ারের অভিজ্ঞতা	১১
গোয়ালিয়ারের অভিজ্ঞতা	২০

BANGLADARSHAN.COM

॥গোয়ালিয়রে রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের সমাধি দর্শন–একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি॥

সিংহাসন হিল উঠে রাজবংশ নে ভ্রুকুটি তানি থি,
বুন্দে ভারতমে ভী আই ফির সে নয়ি যবানি থি,
গুমি হুই আজাদী কী কিমত সবনে পেহচানি থি,
দূর ফিরঙ্গি কো করনে কী সবনে মন মে ঠানি থি।
বুন্দেলে হারবোলি কে মূহ হুমনে শুনি কাহানি থি
খুব লড়ি মারদানি ওহ তো ঝাঁসি বালি রাণী থি।

ওপরের কবিতাটা হিন্দী জনপ্রিয় কবি সুভদ্রা কুমারী চৌহানের লেখা ঝাঁসির বীরাঙ্গনা রাণী লক্ষ্মীবাইকে নিয়ে যার শেষ দুটো লাইন খোদাই করা আছে গোয়ালিয়রে রাণীর সমাধি ক্ষেত্রের ওপরে। সেখানে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধায় আর দুঃখে চোখে জল এসে যায় ভাবলে যে এমন করে অন্যের বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য উনি চুকিয়ে গেলেন নিজের প্রাণ দিয়ে, রাজপরিবার আজও আছে তাদের ঐতিহ্য নিয়ে কিন্তু লোকের মুখে মুখে ফেরে রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের বলিদানের কথা, তাঁর সাহসিকতার গাথা।

বারাণসীর মণিকর্ণিকাতে ১৮২৮ সালের ১৯শে নভেম্বর জন্মালো মনু যার প্রকৃত নাম ছিল মণিকর্ণিকা তামবে পরে যিনি ভারতের ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেন মহারাণী লক্ষ্মীবাই হিসেবে। তিনি মহারাষ্ট্রের মারাঠী করাডে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯ নভেম্বর, ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে কাশী (বারানসী) এলাকায় তার জন্ম। তার বাবার নাম ‘মরুপান্ত তাম্বে’ এবং মা ‘ভাগীরথী বাঈ তাম্বে।’ চার বছর বয়সেই তিনি মাতৃহারা হন। পারিবারিক পরিবেশে বাড়িতে শিক্ষালাভ করেন লক্ষ্মী বাঈ। বিথুরের পেশোয়া আদালতে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন তার পিতা। সেখানে পরবর্তীতে নিজ কন্যাকে মনের মতো করে গড়ে তুলতে থাকেন মরুপান্ত তাম্বে। লক্ষ্মীবাঈকে ছাবিলি নামে ডাকতেন পেশোয়া, যার অর্থ ‘ক্রীড়াপ্রেমি সুন্দরী কন্যা।”

বাবা কোর্টের কাজ-কর্মে জড়িত থাকায় মনু ঐ সময়ের অধিকাংশ নারীদের তুলনায় অধিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পেরেছিলেন। আত্মরক্ষামূলক শিক্ষালাভের পাশাপাশি ঘোড়া চালনা, আর্চারী শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন তিনি। এছাড়াও তিনি তার বান্ধবীদেরকে নিয়ে নিজস্ব একটি বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন।

১৮৪২ সালে ঝাঁসীর মহারাজা গঙ্গাধর রাও নিওয়াকরের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন মনু ওরফে লক্ষ্মীবাঈ। এভাবেই তিনি ঝাঁসীর রাণী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। বিয়ের পরই তার নতুন নামকরণ হয় লক্ষ্মীবাঈ হিসেবে। ১৮৫১ সালে তাদের একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। নাম রাখা হয় দামোদর রাও। চার মাস পর সন্তানটি মারা যায়। পুত্র শোক ভুলতে রাজা এবং রাণী উভয়েই আনন্দ রাওকে দত্তক নেন। আনন্দ রাও ছিলেন

গঙ্গাধর রাওয়ের জ্যেঠতুতো ভাইয়ের ছেলে। জীবিত থাকা অবস্থায় ঝাঁসীর রাজা তার পুত্রের মৃত্যু রহস্য কখনো উদ্‌ঘাটন করতে পারেননি। ঝাঁসীর মহারাজা গঙ্গাধর রাও ২১ নভেম্বর, ১৮৫৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আনন্দ রাওকে দত্তক নেয়ায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী'র দখল স্বত্ত্ব বিলোপ নীতির কারণে তার সিংহাসন আরোহণে প্রতিবন্ধকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ডালহৌসী জানান যে, ঝাঁসীর সিংহাসনে প্রকৃত উত্তরাধিকারী নেই এবং ঝাঁসীকে কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাধীনে নেয়া হবে। মার্চ, ১৮৫৪ সালে ঝাঁসীর রাণীর নামে বার্ষিক ৬০,০০০ ভারতীয় রূপি ভাতা হিসেবে মঞ্জুর করা হয় এবং ঝাঁসীর কেল্লা পরিত্যাগ করার জন্য হুকুম জারী হয়।

১০ মে ১৮৫৭ সাল। ঐদিন মিরাটে ভারতীয় সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা ঘটে। চারদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, লি ইনফিল্ড রাইফেলের আচ্ছাদনে শুকরের মাংস এবং গরুর চর্বি ব্যবহার করা হয়। এরপরও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী রাইফেলে শুকরের মাংস এবং গরুর চর্বির ব্যবহার অব্যাহত রাখে। তারা বিবৃতি দেয় যে, যারা উক্ত রাইফেল ব্যবহারে অসম্মতি জানাবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এবং আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও শুরু করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। এই বিদ্রোহে সিপাহীরা অনেক ব্রিটিশ সৈন্যসহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে নিযুক্ত কর্মকর্তাদেরকে হত্যা করে।

ঐ সময়ে লক্ষ্মীবাঈ তার বাহিনীকে নিরাপদে ও অক্ষত অবস্থায় ঝাঁসী ত্যাগ করাতে পেরেছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী প্রবল গণআন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এই চরম মুহূর্তে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অন্যত্র মনোযোগের চেষ্টা চালায়। লক্ষ্মীবাঈ একাকী ঝাঁসী ত্যাগ করেন। তার নেতৃত্বে ঝাঁসীতে শান্ত ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রয়েছিল। হলদী-কুমকুম অনুষ্ঠানে ঝাঁসীর রমণীরা শপথ গ্রহণ করেছিল যে, যে-কোন আক্রমণকেই তারা মোকাবেলা করবে এবং প্রতিপক্ষের আক্রমণকে তারা ভয় পায় না।

এ প্রেক্ষাপটে তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনায় দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। ৮ জুন, ১৮৫৭ সালে জোখনবাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে কর্মরত কর্মকর্তাসহ স্ত্রী-সন্তানদের উপর গণহত্যার বিষয়ে তার ভূমিকা নিয়ে বেশ বিতর্ক রয়েছে। অবশেষে তার দ্বিধাগ্রস্থতা কেটে যায় যখন ব্রিটিশ সৈন্যরা স্যার হিউজ রোজের (লর্ড স্ট্রাথনায়র্ন) নেতৃত্বে ঘাঁটি গেড়ে বসে এবং ২৩ মার্চ, ১৮৫৮ তারিখে ঝাঁসী অবরোধ করে। লক্ষ্মীবাঈ তার বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেন এবং এ অবরোধের প্রেক্ষাপটে তিনি প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন। ঝাঁসী এবং লক্ষ্মীবাঈকে মুক্ত করতে বিশ হাজার সৈনিকের নিজস্ব একটি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অন্যতম বিদ্রোহী নেতা তাতিয়া তোপে। তবে, ব্রিটিশ সৈন্যদলে সৈনিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ১,৫৪০জন। স্বল্প সৈনিক থাকা স্বত্ত্বেও তাতিয়া তোপে ব্রিটিশ সৈন্যদের অবরোধ ভাঙ্গতে পারেননি। ব্রিটিশ সৈনিকেরা ছিল প্রশিক্ষিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ যা প্রতিপক্ষের আনাড়ী ও অনভিজ্ঞ সৈনিকেরা তাদের ৩১ মার্চের আক্রমণে টিকতে পারেনি। লক্ষ্মীবাঈয়ের নিজস্ব বাহিনী এ আক্রমণ সহ্য করতে পারেনি। আক্রমণের তিন দিন পর ব্রিটিশ সৈন্যদল দুর্গের দেয়ালে ফাটল ধরায় এবং ঝাঁসী শহরটি করায়ত্ব করে নেয়। এর পূর্বেই এক রাতে দুর্গের দেয়াল থেকে সন্তানসহ লাফ দিয়ে লক্ষ্মীবাঈ প্রাণরক্ষা করেন। ঐ সময় তাকে ঘিরে রেখেছিল তার নিজস্ব একটি দল, যার অধিকাংশই ছিল নারী সদস্য।

আনন্দ রাওকে সাথে নিয়ে রাণী তার বাহিনী সহযোগে বাণিজ্যিক বিনিয়োগের উর্বর ক্ষেত্র কাল্পীতে যান। সেখানে তিনি অন্যান্য বিদ্রোহী বাহিনীর সাথে যোগ দেন। তাতিয়া তোপের নেতৃত্বেও একটি বিদ্রোহী দল ছিল। এরপর রাণী লক্ষ্মীবাঈ এবং তাতিয়া তোপে গোয়ালিয়রের দিকে রওনা দেন। সেখানে তাদের যৌথবাহিনী গোয়ালিয়রের মহারাজার দলকে পরাজিত করে। পরাজিত বাহিনীর সদস্যরা পরবর্তীতে যৌথবাহিনীর সাথে একত্রিত হয়। তারপর কৌশলগত অবস্থানে থাকা গোয়ালিয়রের কেল্লা দখল করে বাঈ এবং তোপের সম্মিলিত বাহিনী।

১৭ জুন, ১৮৫৮ সালে (মতান্তরে ১৮৫৭ সালে) সালে ফুলবাগ এলাকার কাছাকাছি কোটাহ-কি সেরাইয়ে রাজকীয় বাহিনীর সাথে পূর্ণোদ্দম্যে যুদ্ধ চালিয়ে শহীদ হন রাণী। ১৭ জুন ১৮৫৮ গোয়ালিয়রের ফুল বাগের কাছে কোটাহ-কি-সেরাইতে, ক্যাপ্টেন হেনেজের অধীনে অষ্টম (রাজকীয় আইরিশ রাজার অধীনে) হুসারদের একটি স্কোয়াড্রন, যুদ্ধে অবতীর্ণ হল রানী লক্ষ্মীবাইয়ের নেতৃত্বে বৃহৎ ভারতীয় বাহিনীর সাথে। তাদের সাথে লড়াই করেছিল যারা এলাকা ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। অষ্টম হুসাররা ভারতীয় বাহিনীকে আক্রমণ করে, ৫০০০ ভারতীয় সৈন্যকে হত্যা করে, যাদের মধ্যে কোন ভারতীয়ই "১৬ বছরের বেশি বয়সী" ছিল না । তাদের কাছে দুটি বন্দুক ছিল এবং ফুলবাগ শিবিরের মধ্যে থেকে যুদ্ধ চালিয়েছিল। এই যুদ্ধের সময়ে, একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুসারে,: রানী লক্ষ্মীবাঈ সৈনিকের পোশাকে সজ্জিত হয়ে একজন হুসারকে আক্রমণ করেন; রাণী নিজে ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং আহতও হন, সম্ভবত সেই সৈনিকের দ্বারা। কিছুক্ষণ পরে, যখন তিনি রাস্তার ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় বসে ছিলেন, তিনি সৈনিকটিকে চিনতে পেরে একটি পিস্তল দিয়ে তার দিকে গুলি চালান, যার ফলে সে "তার কারবাইন দিয়ে যুবতী লক্ষ্মীবাইকে আক্রমণ করে।"

সেসময় গোয়ালিয়ারের সিন্ধিয়ারা রাজত্ব করতেন, গোয়ালিয়ার দুর্গ দখল করে নিয়ে রাণী লক্ষ্মীবাই ছিলেন সেই দুর্গে, সঙ্গে ছিল তাঁর আহত ঘোড়াটি। তৎকালীন সিন্ধিয়ারাজা জায়াজি রাও সিন্ধিয়া পরাজিত হয়েছিলেন রাণীর কাছে, তাঁকে চলতে হচ্ছিল রাণীর কথা মেনে, সেই ক্ষোভে তিনি ব্রিটিশ রাজশক্তির কাছে রাণী গোয়ালিয়র দুর্গের ওপরে যেখানে ছিলেন সেই সুড়ঙ্গ পথটি দেখিয়ে দেন তাদের, একটা পুঁচকে মেয়ের কথায় চলবেন না বলে তিনি এই বিশ্বাসঘাতকতাটা করেন। রাণী দুর্গের ওপর থেকে সুড়ঙ্গ পথে বেরোতে গিয়ে দেখেন সেই সুড়ঙ্গ পথটি দিয়েই উঠে আসছে ব্রিটিশ সৈন্য, উনি ওনার আহত ঘোড়া সহ লাফ দিয়ে নিচে পড়েন। নীচে এক সাধুর কুটির ছিল, তাঁকে অনুরোধ করেন রাণীর দেহ সহ যেন সাধু কুটিরে আগুন লাগিয়ে দেন যাতে তাঁর দেহ না পড়ে ব্রিটিশদের হাতে, সাধু রাণীর সেই ইচ্ছের মর্যাদা দিয়েছিলেন। আজও এই সিন্ধিয়া রাজ পরিবার স্থানীয় লোকেদের কাছে পরিচিত হয়ে আছে "গাদ্দার বা বিশ্বাসঘাতক" হিসেবে।

অন্য একটি বর্ণনা অনুসারে ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই যোদ্ধার পোশাক পরেছিলেন। তিনি অশ্বারোহী অবস্থায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন; তিনি চাননি তার মৃতদেহের দখল ব্রিটিশ সৈন্যদের হাতে পড়ুক, তিনি একজন সন্ন্যাসীকে এটি পুড়িয়ে ফেলতে বলেছিলেন। তার মৃত্যুর পর স্থানীয় কয়েকজন তার লাশ দাহ করেন।

হিউ রোজ মন্তব্য করেছেন যে রানী লক্ষ্মীবাই “ব্যক্তিত্বপূর্ণ, চতুর এবং সুন্দর” এবং তিনি “সব ভারতীয় নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক।” তার মৃত্যুর বিশ বছর পর কর্নেল ম্যালেসন লিখেছেন হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান মিউটিনি; ভলিউম 3; লন্ডন, 1878 ব্রিটিশের চোখে তার যত দোষই থাকুক না কেন, তাঁর দেশবাসীরা সর্বদা তাঁকে মনে রাখবে যে তাকে খারাপ আচরণের দ্বারা বিদ্রোহে চালিত করা হয়েছিল, এবং তিনি তার দেশের জন্য বেঁচে ছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন, আমরা ভারতের জন্য তার অবদান ভুলতে পারি না। সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান শহীদ ছিলেন রাণী লক্ষ্মীবাই।

পরবর্তীতে আরো তিনদিন পর ব্রিটিশ সেনাদল গোয়ালিয়র পুণর্দখল করে। যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পক্ষে জেনারেল হিউজ রোজ তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, “রাণী তার সহজাত সৌন্দর্য্য, চতুরতা এবং অসাধারণ অধ্যবসায়ের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। এছাড়াও, তিনি বিদ্রোহী সকল নেতা-নেত্রীর তুলনায় সবচেয়ে বিপজ্জনক ছিলেন।”

কীর্তিগাথা:-

রাণী লক্ষ্মীবাঈ ভারতবর্ষের ‘জাতীয় বীরাঙ্গনা’ হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি পান। তাকে ভারতীয় রমণীদের সাহসিকতার প্রতীক ও প্রতিকল্প হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। সুভাষচন্দ্র বসু’র নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম নারী দলের নামকরণ করেন রাণী লক্ষ্মী বাঈকে স্মরণপূর্ব্বক।

ভারতীয় মহিলা কবি সুভদ্রা কুমারী চৌহান (১৯০৪-১৯৪৮) রাণী লক্ষ্মীবাঈকে স্মরণ করে ওপরের কবিতাটি লেখেন। কবিতার নামকরণ করা হয় ঝাঁসী কি রাণী, যাতে জাতীয় বীরাঙ্গনা হিসেবে তাকে উল্লেখ করেছেন তিনি।

১৮৭৮ সালে কর্ণেল ম্যালসন লিখিত “দ্য হিস্ট্রি অব দ্য ইন্ডিয়ান মুটিনি” পুস্তকে লক্ষ্মীবাঈ বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি লিখেন, “...তার জনগণ সর্বদাই তাঁকে স্মরণ করবে। তিনি নিষ্ঠুরতাকে বিদ্রোহের পর্যায়ে উন্নীত করার মাধ্যমে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি জীবিত আছেন এবং স্বীয় মাতৃভূমির জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।”

সাম্প্রতিককালে, ২১ জুলাই, ২০১১ তারিখে লক্ষ্মী বাঈকে বিশ্বের শীর্ষ ১০ জন ডানপিটে রমণীদের একজন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যারা তাদের স্বামীদের কাছ থেকে সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছিলেন। টাইম ম্যাগাজিনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। তালিকায় ঝাঁসীর রাণীর অবস্থান ছিল ৮ম (অষ্টম)।

ব্রোঞ্জ মূর্তিতে খচিত ভাস্কর্য্যে রানী লক্ষ্মীবাঈকে ঝাঁসীতে এবং মর্মর মূর্তিতে গোয়ালিয়রে–উভয় শহরেই ঘোড়ায় আরোহিত অবস্থায় অঙ্কিত করা হয়েছে। আমার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর সমাধি ক্ষেত্রটি দেখার ও তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর, মন ভারাক্রান্ত হয়েছে তাঁর মর্মর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে, চোখে জল এসেছে তাঁর অশ্বারোহি মূর্তিটির

সামনে দাঁড়িয়ে–একজন নারী হিসেবে, একজন ভারতীয় হিসেবে খুবই গর্বের এমন একজন দেশপ্রেমিক পূর্বসূরীর সমাধিস্থল দর্শন করা আর ভাবলে খুবই লজ্জিত হতে হয় যে বার বার আমাদের জাতীয় সংহতি কোনো একজন দেশেরই লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় পর্যুদস্ত হয়েছে কিছু ক্ষুদ্র স্বার্থের অহংকারে। নীচের ছবিগুলো সেই সমাধিক্ষেত্রের আমার নিজস্ব সংগ্রহ।

দেয়ালে খোদিত সেদিনের ঘটনা

महारानी लक्ष्मीबाई का संक्षिप्त परिचय
महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वि.स. 1891 (ई.सन् 1834) कार्तिक सुदी 14 को वाराणसी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपके बचपन का नाम मनु, माता का नाम भागीरथी बाई तथा पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। आपका विवाह झाँसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ। पति की मृत्यु के बाद झाँसी का शासन महारानी ने अपने हाथों में लिया और बड़ी कुशलता के साथ शासन किया। अंग्रेज सरकार द्वारा दत्तक पुत्र को मान्यता न देने और झाँसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के निर्णय का विरोध आपने किया। वर्ष 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुई क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई की अहम भूमिका थी। लक्ष्मीबाई ने झाँसी के किले में 10 दिन तक अंग्रेजों से घनघोर युद्ध किया और इसके बाद ग्वालियर पहुँची। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक अंग्रेजी सेना से युद्ध किया और 23 वर्ष की युवा अवस्था में ही वि.स. 1914 (1857 ई.) ज्येष्ठ सुदी 7 को वीरगति को प्राप्त हुयी। स्थानीय लोगों ने इसी स्थल पर घास मंडी में दाह संस्कार कर महारानी लक्ष्मीबाई को अजर-अमर बना दिया।
आयुक्त
पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय
म.प्र. भोपाल
পাহাড়ের ওপরে সেই দুর্গের প্রাচীর
যার ওপর থেকে উনি ঘোড়া সমেত
লাফিয়েছিলেন।

বিভিন্ন দিক থেকে

॥গোয়ালিয়ারের অভিজ্ঞতা॥

প্রথম পর্ব:-

******

গতবছর ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে আমার কন্যা ভর্তি হয়েছে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি নিয়ে এম এতে অ্যামিটি ইউনিভার্সিটি গোয়ালিয়ারে, তার আগে এন্ট্রান্স হয়েছে দেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে, সবগুলোতেই চান্স পেয়েছিল ও, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে না আগেই ঠিক করেছিল ও, তাও কলকাতায় চান্স পেয়েছিল কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের গ্রাজুয়েশন ফাইনাল নিয়ে এমন গড়িমসি, চাপান উতোর চালালো ইউ জি সির সঙ্গে যে ফাইনাল হল সেই অক্টোবরে। তারমধ্যে দুমাস ধরে ক্লাস চলছে ওদের অ্যামিটি গোয়ালিয়ারে অনলাইনে, সেই অনলাইনেই ফার্স্ট সেমিস্টার, সেকেন্ড সেমেস্টার হয়েছে অতিমারীর কারণে। থার্ড সেমিস্টারটাও তাই হবার কথা ছিল, আমরা মানসিকভাবে সেরকম প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। ২০২১ নভেম্বরের কুড়ি তারিখে মধ্যপ্রদেশ সরকার ঘোষণা করে দিল ফার্স্ট ডিসেম্বর থেকে সমস্ত পরীক্ষা সবাইকে এম পি তে অফলাইনে বসে দিতে হবে, ততদিনে থার্ড সেমিস্টারের ডেট এনাউন্স হয়ে গেছে যে সাতই ডিসেম্বর থেকে ভাইভা হবে আর ১৩ থেকে ২৩ হবে থার্ড সেমিস্টার, অ্যামিটি গোয়ালিয়ার বলে দিল ওদের ফার্স্ট ডিসেম্বর থেকে ইউনিভার্সিটির ক্লাসে সশরীরে জয়েন করতে হবে। দেখা গেল ৩০শে নভেম্বরের আগে ট্রেনে কোনো টিকিট নেই, তাই ৩০শে নভেম্বরের আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট হাওড়া চম্বল এক্সপ্রেসের টিকিট কাটা হল, আরেকটা কারণ ট্রেনে যাবার মেয়ের সমস্ত বইখাতা, জামাকাপড়, শীতের পোশাক বয়ে নিয়ে যেতে হবে, গোয়ালিয়ারে প্রচন্ড ঠান্ডা পড়ে। এই দশদিনের মধ্যে ওর হোস্টেল খুঁজে সেখানে কথা বলা, আমাদের থাকার গেস্ট হাউস ঠিক করা সব হল, অ্যামিটি ইউনিভার্সিটি বলে দিল এতো শর্ট নোটিসে ওরা হোস্টেল স্যানিটাইস করে বাস করার উপযোগী করতে পারবে না, তাই মেয়ের হোস্টেল ঠিক হল আদিত্যপুরমে আর আমাদের গেস্ট হাউস ডিডি নগরে।

তিরিশ তারিখে বিকেল ৫:৪৫ এ ট্রেন, দুটো ট্যাক্সি নিয়ে বেরোলাম আমরা, কারণ মেয়ের একারই চারটে লাগেজ, ট্যাক্সি বেহালা থেকে হাওড়া স্টেশন নিল ১২০০/- টাকা। ওখানে কুলি নিল তাদের ট্রলিতে বসিয়ে ট্রেনে তুলে দিতে ৯০০/- টাকা। ট্রেন ছাড়লো, আমাদের এ সি টু টায়ারে টিকিট। ট্রেন আসানসোল ছাড়ালো রাত দশটা নাগাদ, আমরা শুয়ে পড়লাম। পরেরদিন টের পেলাম সমস্যাটা, মানিকপুর জংশনের পরে যেটায় বেলা নটায় ঢোকে ট্রেন আর কোথাও কিচ্ছু পাওয়া যায়না, না খাবার না চা-একদম ধু ধু স্টেশন, আবার গোয়ালিয়ার থেকে সব পাওয়া যায়। কিন্তু এই রাস্তায় পড়ে মোঘলসারাই, প্রয়াগরাজ চেওকি, ঝাঁসি, চিত্রকুটধাম, ওরছা যেগুলো ঐতিহাসিক, ধর্মীয় এবং পৌরাণিক দর্শনীয় স্থান। পাথুরে পাহাড়ে ভরা বটে কিন্তু নদী, জলাশয় আর সবুজের সমারোহ আর অনাড়ম্বর জীবনের চিত্র চোখের আর মনের আরাম দেয়।

আমরা গোয়ালিয়ারে নামলাম বিকেল সোয়া পাঁচটা নাগাদ, ট্রেন মিনিট পঁচিশেক লেট করেছে। অ্যামিটির একজন প্রফেসর অটোওলাদের নম্বর দিয়ে দিয়েছিল, তাদের সাথে ফোনে কথা বলা হয়েছিল, তারা স্টেশনে ছিল। গোয়ালিয়ার স্টেশনে কুলি নিল আরো পাঁচশো টাকা লাগেজের জন্য। দুটো অটোতে লাগেজ তুলে প্রথমে

গেলাম আমাদের ডি ডি নগরে গুরুকৃপা গেস্ট হাউসে। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার অ্যামিটি গোয়ালিয়ার কিন্তু শহর ছাড়িয়ে এয়ারপোর্টের কাছে। এই ডি ডি নগর, আদিত্যপুরম দুটোই প্রধান গোয়ালিয়ারের প্রাণকেন্দ্র সিটি সেন্টার বা ফোর্ট থেকে বেশ দূরে। এখানে প্রধান যাতায়াতের মাধ্যম কিন্তু অটো, তারও আবার নম্বর আছে, যেমন চার নম্বর, পাঁচ নম্বর,আট নম্বর,দুই নম্বর-এদের মধ্যে চার নম্বর অটো যাতায়াত করে আদিত্যপুরম থেকে সিটি সেন্টার, পিন্টো পার্ক। পিন্টো পার্ক বেশ বড়ো বাজার যেটা আদিত্যপুরমের থেকে কাছে যেখানে ফল, সব্জি, মিষ্টি, জামাকাপড় পাওয়া যায়। ডি ডি নগর থেকে হেঁটে আদিত্যপুরম লাগে আধঘন্টা আর ডি ডি নগর সংলগ্ন দুটো বাজার চাওলা মার্কেট আর খুশওয়া মার্কেট আর মার্কেট কমপ্লেক্স হল মহারাজা কমপ্লেক্স। সেগুলো মোটামুটি ভালোই বাজার। খুশওয়া মার্কেট আর মহারাজা কমপ্লেক্স আদিত্যপুরমের পরের চৌমাথার মোড় যেটা আদিত্যপুরম থেকে হেঁটে পাঁচ মিনিট, সেটার থেকে চার নম্বর অটো যায়। কিন্তু ডিডি নগর থেকে অটো পাওয়া মুস্কিল, তবে ডি ডি নগর থেকে আদিত্যপুরম বা পিন্টো পার্ক দশ টাকার অটো পাওয়া যায়। অ্যামিটি গোয়ালিয়ার, আদিত্যপুরম, ডিডি নগর, এয়ারপোর্ট সবগুলো জায়গাই মূল শহর থেকে অনেকটাই বাইরের দিকে।

ডিডি নগর বা দীনদয়াল নগর হল ভিন্ড রোডের ওপরে, আমরা ওখানে গিয়ে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে লাগেজ রেখে বেরিয়ে মেয়ের গেস্ট হাউস আদিত্যপুরমে যাব এমনই পরিকল্পনা করেছিলাম, আমাদের গেস্ট হাউসের ঘরে লাগেজ রাখার সময় ওয়াশরুমটা যে একধাপ উঠে গিয়ে সেটা বুঝতে না পেরে একটা পেল্লাই আছাড় খেলাম মার্বেলের মেঝেতে। ওখান থেকে বেরিয়ে মেয়ের গেস্ট হাউসে মেয়েকে রেখে ওর লাগেজ তুলে দিয়ে এসে আবার ফেরত এলাম আমাদের গেস্ট হাউসে। সেদিন রাত্রে আমরা সঙ্গের শুকনো খাবার খেয়ে কাটিয়ে দিলাম কারণ ট্রেন জার্নির জন্য, টানাপোড়েন এসব মিলিয়ে খুব ক্লান্ত ছিলাম।

পরেরদিন গেলাম সকালে মেয়ের কম্বল, বালিশ, ইলেকট্রিক কেটলি, ইত্যাদি ওর প্রয়োজনের জিনিস কিনতে কারণ আগের দিন রাত্রে ওর শীতে বেশ কষ্ট হয়েছে। গুরুকৃপা থেকে বেরিয়ে “ইট স্ট্রিট” রেস্টুরেন্টে খেলাম ব্রেকফাস্ট পনির পরোটা আর চা, এখানকার যিনি হেড কুক তিনি বাঙ্গালী, জয়ন্ত দে, বর্ধমানের লোক, কিন্তু পঁচিশ বছর গোয়ালিয়ারে আছেন, বাংলা একরকম ভুলেই গেছেন, বিয়ে করে সংসার পেতেছেন ওখানেই।কিন্তু বাঙ্গালী দেখলে অভিভূত হয়ে পড়েন, আমাদের খুবই যত্ন করেছেন উনি। ওখানে খেয়ে বেরিয়েই এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় বেকায়দায় পা পড়ে একদম মুখ থুবড়ে আছাড় খেলাম আবার। আগেরদিন লাগলেও কাটেনি কোথাও, সেদিন কিন্তু ভীষণ চোট পেলাম, হাত, দুটো হাঁটু, ঠোঁট কাটলো, কালশিটে পড়লো, দাঁতে আর কনুইতে এমন লাগলো যে এখনো সেব্যথা রয়েছে এতদিন পরেও, চশমার কাঁচ চিড় খেলো, মোবাইলের স্ক্রিনেও চিড় ধরেছে।

কিন্তু তবু সেসব নিয়ে দোকান থেকে ডেটল আর তুলো কিনে ফার্স্ট এইড করে সেই অবস্থাতেই মেয়ের জিনিসগুলো কিনতে গেলাম পিন্টো পার্কের বাজার থেকে। আমরা ব্রেকফাস্টে শুধু ফল খাই, সেসব কেনা হল, মেয়ে চলে গেছে সকালে তার ইউনিভার্সিটির ক্লাসে ওর হোস্টেল থেকে অটো শেয়ার করে। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে আমাদের এই চাওলা মার্কেট, খুশওয়া মার্কেট, মহারাজা কমপ্লেক্স, পিন্টো পার্ক দেখিয়ে জিনিস কিনিয়ে দিল গুরুকৃপা গেস্ট হাউসের কেয়ারটেকার ছেলেটি বিনয় ত্রিপাঠি। সত্যি বলতে কী, এই ছেলেটি খুবই সাহায্য করেছে

আমাদের ওখানে সবসময় সব ব্যাপারে, গেষ্ট হাউসের যিনি মালিক সেই রাধেশ্যাম ত্রিপাঠি, তাঁর দুই ছেলে এরাও খুব সহযোগিতা করেছে আমাদের সাথে।

রাধেশ্যাম ত্রিপাঠির স্ত্রী হচ্ছেন গোয়ালিয়ার শহরের বিধায়ক, রাধেশ্যাম ত্রিপাঠির নিজের চারটে টাইলসের দোকান গোয়ালিয়ার শহরে আর এই চারতলা বাড়িটা উনি বয়েজ হোস্টেল হিসেবে ভাড়া দেন। দুতলা, তিনতলা সবটাই বয়েজ হোস্টেল, একতলাটা আছে ফ্যামিলির লোক বা বিয়েবাড়ির আত্মীয় স্বজনদের ভাড়া দেবার জন্য আর চারতলাটা বিরাট ছাদ। ঘরগুলো বেশ বড়ো, খাট আর আলমারি আছে একটা করে, কম্বল, বালিশসহ, অ্যাটাচড বাথরুম, কিন্তু এখানে বেশিরভাগ বাড়িতে মত গিজার নেই, বোরওয়েলের জল সোলার প্যানেল দিয়ে আসে। সূর্য না উঠলে সেদিন ইমারসন রড দিয়ে জল গরমের ব্যবস্থা শীতে। আশেপাশে প্রচুর দোকান আছে। এখানে একটা কথা বলতেই হবে, গোয়ালিয়ার আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা ছিল, কিন্তু ওখানকার লোকজনের ব্যবহার এতো সহযোগিতাপূর্ণ ও আন্তরিক যে আমাদের একটা সময় পরে আর মনে হয়নি আমরা ওখানে বাইরের লোক। যে দুটো জায়গায় খেতে যেতাম আমরা, তাদের মালিক থেকে, ওয়েটার সবায়ের ব্যবহার খুবই আন্তরিক, সর্বদা সাহায্য করতে প্রস্তুত ।

ডিডিনগর বা দীনদয়াল নগর জায়গাটায় সেনাবাহিনীর লোকেরা বাড়ি করেছে, আর আছে গুজ্জররা, প্রায় প্রতি বাড়িতে গরু আর মোষের গোয়াল গুজ্জরদের যেখানে সকালে আর সন্ধেবেলায় বহু লোককে দেখেছি হাতে স্টীলের ক্যান ঝুলিয়ে দুধ নিয়ে যায় এসে, অনেকটা আমাদের আগেকার গ্রামবাংলার পুকুরঘাটের মত, সুখদুঃখের কথা, আদান প্রদান, মন দেওয়া নেওয়া সবই চলে এখানে এই দুধ নিতে এসে। একারণেই এখানে প্রচুর ডেয়ারি আছে, দুধ, ঘি, দই, খোয়া,পনির বিক্রি হয় কিন্তু ছানার মিষ্টি তৈরী করতে পারেনা, তাই গোয়ালিয়ারে ছানার মিষ্টি মানে সন্দেশ, রসগোল্লা পাওয়া যায় না। মিষ্টি বলতে ওরা বোঝে মিহিদানার লাড্ডু, মতিচুর লাড্ডু, কাজু বরফি, ক্ষীরের বরফি, তিল আর গুড় দিয়ে বানানো গজক, মুড়ির মোয়া, বাদামের চিক্কি, সোনপাপড়ি, গাজরের হালুয়া, বেসনের লাড্ডু আর বরফি, মুগের লাড্ডু এইসব-বেশিরভাগ ঘি দিয়ে বানানো। গোয়ালিয়ারে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি আর গুজরাটের প্রচুর লোকের বাস, বুন্ডেলখন্ড মালভূমির অংশ যেহেতু তাই একদম পাথুরে পাহাড়ী জায়গা। এখানে একটা মিশ্র সংস্কৃতি আছে আর এখানে এখনো “ব্রাহ্মণ মানে বর্ণশ্রেষ্ঠ” এই ব্যাপারটা আছে। দীনদয়াল নগরের খুব কাছে গোয়ালিয়ার এয়ারপোর্ট যেটা মূলতঃ যুদ্ধবিমান ও তার ট্রেনিংয়ের জন্য বিখ্যাত। আমাদের ভিন্ড রোডের ওপরে যে শ্রীরাম ভোজনালয় ধাবাতে খেতে যেতে হয়, রোজই দেখি সামরিক পোশাকে কোনো না কোনো পাইলট সেখানে উল্টোদিকের টেবিলে বসে খাচ্ছে।অ্যামিটি ইউনিভার্সিটি দীনদয়াল নগরের থেকে বেশী কাছে।

আমাদের গেস্ট হাউসের দোতলায় ভাড়া থাকতে এসেছেন ব্যাঙ্গালোর থেকে তামিলনাড়ুর ইঞ্জিনিয়ার বালাচন্দের বা বালা, ও ওখানে এসে আছে যুদ্ধবিমান মেরামতির কাজের জন্য। বালা আবার তন্ত্রসাধনা করে, বেশ ভালো জ্যোতিষী, আবার মুখ দেখে বা ছবি দেখে লোকের সম্পর্কে বলে দেয়।এর সাথে আমাদের খুব ভালো জমে গেছে।

একদিন দুপুরে খেয়ে আমি আর আমার কত্তা একটা অটো নিয়ে চলে গেলাম এয়ারপোর্ট দেখতে, বেশ অনেকটা গিয়ে ঘুরে এবারে হেঁটে হেঁটে চলে এলাম অ্যামিটি ইউনিভার্সিটি, তখন বেলা চারটে বাজে। আমি গেট থেকে চলে আসছিলাম, আমার কত্তা গিয়ে কথা বললো গেটের সিকিউরিটি অফিসার ইনচার্জের সাথে, আমার মেয়ে বেলা একটায় পরীক্ষা দিয়ে ফিরে গেছে আদিত্যপুরমে ওর গার্লস হোস্টেলে সেদিন। সেই সিকিউরিটি অফিসার শ্রীরণবীর সিং আমাদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন গোটা ক্যাম্পাস ঘুরিয়ে দেখাতে, বললেন, "সন্তান কে লিয়ে মা বাপহি তো সবকুছ হ্যায়, আপলোক ইন্তেজার কিজিয়ে, হম আপকো পুরি ক্যাম্পাস ঘুমাকে দিখা দেঙ্গে।" গাড়ি এল, সেই গাড়ি আমাদের পুরো ক্যাম্পাস ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে তুললো অ্যামিটি ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি রুমে।

সেখানে সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের একজন প্রফেসর আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালেন কনফারেন্স রুমে, অনেকক্ষন গল্প করলেন। তারপরে আবার সেই গাড়ি আমাদের ছেড়ে দিল সেই ঢোকার গেটের মুখে। বিশাল সুন্দর সাজানো গোছানো ক্যাম্পাস অ্যামিটির পাহাড়ের ওপরে, গোটা ক্যাম্পাস তিনটে ব্লকে বিভক্ত, ব্লক এ-ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, ব্লক বি-ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আর ব্লক সি-ওই সাইকোলজি, সোসিওলজি এসব সাবজেক্ট, দুটো হোস্টেল এইচ ১ বয়েজ হোস্টেল আর এইচ ২ গার্লস হোস্টেল, বিশাল প্লেগ্রাউন্ড, ক্যান্টিন, ক্যাফেটেরিয়া নানান ব্রান্ডের খাবারের জিনিসের দোকান যেমন আমূল, ক্যাডবেরি, ডোমিনোস, এমন আর কী। খুব সুন্দর করে রক্ষনাবেক্ষন করে ওখানকার ক্যাম্পাস, ভীষণ পরিচ্ছন্ন, সুন্দর বাগান আর ফল–ফুলের ভর্তি,ক্যাম্পাসে ময়ূর আছে, নানান পাখি আছে, আমরা সব দেখে নিয়ে আবার সাড়ে পাঁচটায় ফিরে এলাম ডিডিনগরে আমাদের গেস্ট হাউসে। আমাদের গেষ্ট হাউসের ছাদ থেকে দেখা যায় অ্যামিটির ক্যাম্পাস।

আরেকদিন মেয়েকে নিয়ে আমরা ঘুরে এলাম গোয়ালিয়ার ফোর্ট, যেখানে ইতিহাস কথা বলে, ফোর্টের সামগ্রিক বর্ণনা দিয়ে লিখেছি আরেকটা পর্ব।

ঝিলমিল শিল্পের টানে: দুর্গের উত্তর-পূবে গোয়ালিয়র গেটের অনতিদূরে ধূলি-ধূসরিত ঘিঞ্জি পুরনো শহরে মোগলি স্থাপত্যে গড়া সংগীতজ্ঞ তানসেনের এবং বাবরকে সহায়তাকারী আফগান প্রিন্স তথা ফকির মহম্মদ ঘাউসের মকবরার পর্যটক আকর্ষণ কম নয়। তানসেনের সমাধির পাশেই আছে সেই তেঁতুল গাছ যেটির নিচে বসে রেওয়াজ করতেন রামতনু পান্ডে পরে ধর্মান্তরিত হয়ে মিঞা তানসেন যিনি ছিলেন আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন এবং হরিদাস স্বামীর শিষ্য। তাঁর সুরের মিষ্টতায় সেই তেঁতুলগাছের ফল ও পাতা নাকি মিষ্টি হয়ে গেছে বলে জনশ্রুতি। চারপাশে ষড়ভুজ টাওয়ার মাঝে গম্বুজ। জাফরি অর্থাৎ গোয়ালিয়রের ঝিলমিলি শিল্পেরও অপূর্ব নিদর্শন মেলে তানসেন ও মহম্মদ ঘাউসের মকবরায়। শহরের উত্তরে বেলেপাথরের মহম্মদ খানের তৈরি জামে মসজিদটিও চলতে ফিরতে দেখে নেয়া যায়।

সেখানে ফোর্ট দেখে এলাম আমরা সুফী মহাত্মা মহাম্মদ ঘাউস আর মিঞা তানসেনের সমাধি দেখতে, তানসেনের সমাধির কাছেই আছে সেই তেঁতুল গাছ যার নিচে বসে তানসেন রেওয়াজ করতেন বলে তার পাতা মিষ্টি হয়ে গেছে। আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন তানসেনের সমাধির আশেপাশে আছে তাঁর

আত্মীয় পরিজনের সমাধি, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জগতে তানসেনের অবদান যেকোনো সঙ্গীতপ্রেমিকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল করতে বাধ্য। জন্মসূত্রে হিন্দু রামতনু পাণ্ডের জন্ম গোয়ালিয়ারে, রেওয়ার রাজা রামচন্দ্র সিংহের সভাগায়ক ছিলেন তিনি, যার সঙ্গীতের খ্যাতি তখনই ছিল ভারতজুড়ে। এই খ্যাতি আকবরের কানে যেতে তিনি চেয়ে পাঠান রামচন্দ্র সিংহের কাছে তানসেনকে তাঁর সভাগায়ক হিসেবে।তানসেনের যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু রামচন্দ্র সিংহ তাঁকে আরো বেশী শ্রোতার শ্রবণের জন্য অনুরোধ করেন যেতে আকবরের সভায়। ১৫৬২ সালে ষাট বছর বয়সে তানসেন যোগ দেন আকবরের সভাগায়ক হিসেবে। তানসেনের পিতা মুকুন্দ পান্ডে ছিলেন একজন ঐশ্বর্যশালী কবি ও সুগায়ক যিনি কিছুদিন বারাণসীর মন্দিরেও পৌরোহিত্য করেন। তানসেনের সঙ্গে রেওয়ার রাজা রামচন্দ্র সিংহের ছিল অকৃত্রিম সখ্যতা, তাই তানসেনের খ্যাতি আরো ছড়িয়ে পড়ুক তিনি চেয়েছিলেন আর তাই আকবর তানসেনকে চেয়ে পাঠাতে তাঁকে রাজী করান যাতে করে আরো বেশী শ্রোতা তাঁর সঙ্গীত রসে পুষ্ট হতে পারে ভেবে। তানসেন ছিলেন রাজা মানসিংহ তোমরের আমলের বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মা হরিদাস স্বামীর শিষ্য যিনি ছিলেন ধ্রুপদে সিদ্ধ।এটা সেই সময় যখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত তার সংস্কৃত ভাবধারা থেকে বেরিয়ে লৌকিক ব্রজভাষা ও হিন্দী এই দুই ভাষায় রূপ নিচ্ছে আস্তে আস্তে। তানসেন উপাধি তাঁকে দেওয়া হয় তাঁর সঙ্গীতের ওপরে অনায়াস দক্ষতা ও তার সাবলীল চলনের জন্য, তার অনবদ্য সঙ্গীত পরিচালনা, আয়োজন ও কণ্ঠের জন্য। তানসেনের স্বরচিত কিছু রাগ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জগতে আজও জনপ্রিয় যার একটি মিঞামল্লার, মিঞা কী টোড়ি।কথিত আছে তানসেন মিঞামল্লার গাইলে বৃষ্টি নামতো আর রাগ দীপক গাইলে আগুন জ্বলে উঠতো। একবার একটা বুনো সাদা হাতিকে রাজা কিছুতেই পোষ মানাতে পারছিলেন না, তানসেন গান গেয়ে তাকে শোনোনোর পরে সে শান্ত হয়ে যায়।

ধ্রুপদ, মূলত রাগসঙ্গীতের একটি ধারা। ধ্রুপদ অর্থ হলো ধ্রুব পদ। ভারতীয় উপমহাদেশে মধ্যযুগ থেকেই ভারতীয় রাগ-সংগীতে এই স্বতন্ত্র ধারার বিকাশ লাভ শুরু হয়। ঐ সময় হতে এধরনের গানের অর্থাৎ গীতরীতির প্রচলন বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে আসছে। এই ধরনের গানে–"স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ" নামে চারটি 'কলি'বা 'তুক' থাকে। কোনো কোনো গানে দুটি তুকও থাকে। এই ধরনের গানে বিশেষ করেই রাগের বিশুদ্ধতা বজায় রাখা হয়। গানের কথাগুলি সাধারণত ভক্তি ও প্রকৃতি বর্ণনামূলক। এজাতীয় গানের মধ্যে কোনো প্রকার চাঞ্চল্য থাকে না। ধ্রুপদকে উচ্চাঙ্গসংগীতে সবচেয়ে অভিজাত বলা হয়। উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধ্রুপদ বা ধ্রুব পদ আসলে শিব বা বিষ্ণুর উপাসনার উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়, বহু ধ্রুবপদ তানসেন নিজে রচনা করেছেন আর গেয়েছেন যেগুলো পুরাণের বিভিন্ন ঘটনার প্রকাশ। পরে তিনি সুফী মহাত্মা মহাম্মদ ঘাউসের কাছেও তালিম নিয়েছিলেন।

রাজা মানসিংহ তোমর-এর পরে মিঞা তানসেন (১৫০৫-১৫৮৫) ধ্রুপদ সঙ্গীতকে উৎকর্ষের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যান। বর্তমানে উত্তরভারতে যে ধ্রুপদ প্রচলিত তার অধিকাংশই মিঞা তানসেন এবং তৎপরবর্তী গুণীমণ্ডলী কর্তৃক রচিত ও গীত হয়ে থাকে। মূলত সম্রাট আকবরের আমলে ধ্রুপদ উত্তর ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় সঙ্গীতে পরিণত হয়। পরবর্তী সময়ে তানসেনের পুত্রবংশীয়, কন্যাবংশীয় এবং শিষ্যদের দ্বারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে।

আরেকদিন গেলাম দেখতে অচলেশ্বর শিবমন্দির যেটা স্বয়ম্ভু লিঙ্গ, যা নাকি রোজ একটু একটু করে তিলে তিলে বাড়ছে। এটা সিন্ধিয়াদের পারিবারিক বিগ্রহ কিন্তু উপস্থিতি তার রাস্তার ওপরে, সঙ্গে বিরাট কালো নন্দী মূর্তি, শিবলিঙ্গ ঢাকা থাকে রূপোর পাত দিয়ে। সেখানে পুজো দিয়ে এলাম রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের সমাধি দেখতে। সেটাও ভীষণ সুন্দর কিন্তু দেখলে মনখারাপ হয়ে যায়। একটা বাচ্ছা মেয়ে শুধু নিজের দেশের জন্য উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে ঘোড়ার পিঠে বসে লাফ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছিলেন সিন্ধিয়াদের বিশ্বাসঘাতকতার মাশুল হিসেবে।
ছবি : নিজেদের মোবাইলে তোলা

অ্যামিটি ক্যাম্পাসের ভেতরে

গুরুকৃপা গেষ্ট হাউসের ছাদ থেকে
অ্যামিটি ক্যাম্পাস
ছাদ থেকে আশেপাশের দৃশ্য

আমাদের গেষ্ট হাউসের সামনে
দুর্গামন্দিরে মা দূর্গা, হনুমানজী
আর গোপাল

গেষ্ট হাউসের ছাদ থেকে দূর্গামন্দির
গেষ্ট হাউসের ছাদ থেকে অ্যামিটি
ইউনিভার্সিটি
গেষ্ট হাউস সংলগ্ন পাহাড়

অচলেশ্বর শিবমন্দির

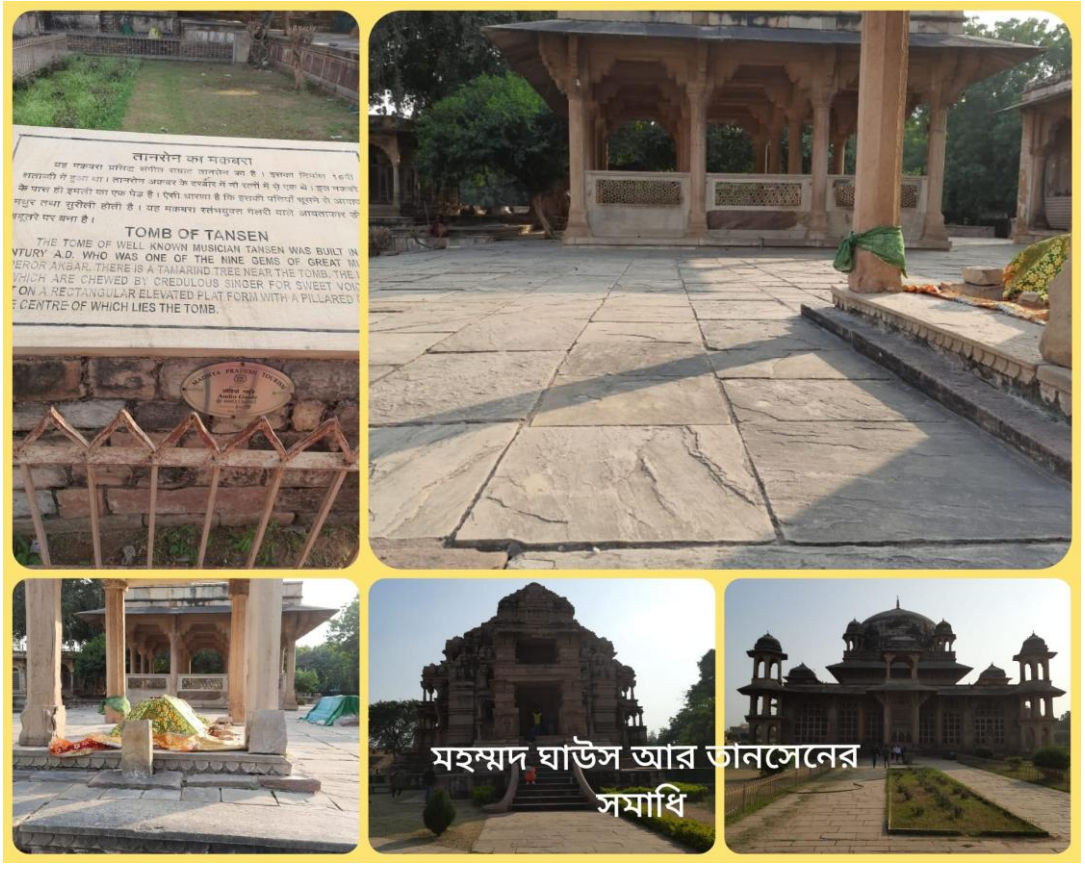
तानसेन का मकबरा
TOMB OF TANSEN
THE TOMB OF WELL KNOWN MUSICIAN TANSEN WAS BUILT IN
VTURY A.D. WHO WAS ONE OF THE NINE GEMS OF GREAT M
PEROR AKBAR. THERE IS A TAMARIND TREE NEAR THE TOMB. THE
WHICH ARE CHEWED BY CREDULOUS SINGER FOR SWEET VOI
T ON A RECTANGULAR ELEVATED PLAT FORM WITH A PILLARED
E CENTRE OF WHICH LIES THE TOMB.
মহম্মদ ঘাউস আর তানসেনের
সমাধি

॥গোয়ালিয়ারের অভিজ্ঞতা॥

দ্বিতীয় পর্ব–গোয়ালিয়ার ফোর্ট:-

****

গোয়ালিয়ার গিয়ে প্রথম যে সমস্যাটার সম্মুখীন হলাম আমরা সেটা মেয়ের মোবাইল সংক্রান্ত, ওর মোবাইল থেকে ও সবাইকে কল করতে পারলেও আমরা কেউ ওকে কল করতে পারছিলাম না। কলকাতায় থাকার সময়ে এই গোয়ালিয়ার যাওয়ার কারণে ওর কানেকশনটা ভোডাফোন থেকে এয়ারটেল করিয়ে ৪জি করা হয়েছিল, ওখানে গিয়ে এই ইনকামিং কল বন্ধ হয়ে গেল ওর মোবাইলে। আমরা পৌঁছেছি পয়লা ডিসেম্বর। দোসরা ডিসেম্বর থেকে এটা শুরু হল। তিন তারিখে খোঁজ খবর নিয়ে চার তারিখে বেলা এগারোটা নাগাদ যাওয়া হল এয়ারটেল সিটি অফিসে গোয়ালিয়ারের সিটি সেন্টারে যেটা শহরের মাঝখানে পুরো অফিসপাড়া, আমাদের ধর্মতলা বা ডালহৌসি চত্বরের মত। ওরা ওখানে দেখে ডিটেক্ট করল এটা সিমটার টেকনিকাল প্রবলেম, সিমটা পাল্টে দিল যেটা পাল্টানোর চার ঘন্টা পরে কাজ করতে আরম্ভ করল আর SMS কাজ করতে আরম্ভ করল চব্বিশ ঘন্টা পরে। ওই এয়ারটেল সিটি অফিস থেকে বেরিয়ে আমরা খেলাম গোয়ালিয়ারের স্ট্রিট ফুড পোহা, কুড়ি টাকা এক প্লেট, বেশ ভালো খেতে আর গরম জালেবি সেটাও ওখানকার বিশেষত্ব। জালেবি পিস দশ টাকা। বেশ ভালো লাগলো খেতে।

পুরোনো গোয়ালিয়ারের অবশ্য দর্শনীয় স্থানের একটা গোয়ালিয়ার দুর্গ বা ফোর্ট। গোয়ালিয়ার দুর্গকে বলা হয় ভারতের দুর্গগুলির মধ্যে মুক্তা সম। স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্বও তার অপরিসীম, বহু গাথা জড়িয়ে আছে দুর্গের স্তম্ভ, মিনার, সুড়ঙ্গ এবং অলিন্দে অলিন্দে, ছড়িয়ে আছে রাজা মানসিংহ তোমর আর তাঁর রাণী মৃগনয়ননীর প্রেমগাথা ছড়ানো, রাজপূত কুলবধূদের জহরব্রতের দীর্ঘশ্বাস জড়িয়ে আছে থামের সঙ্গে, হিন্দু রাজাদের শৌর্য গাথার সগৌরব উচ্চারণ আছে আবার কোণে কোণে ছড়িয়ে আছে মুঘল শাসক জাহাঙ্গীর, ঔরংজেবের নিষ্ঠুরতা নিদর্শন ছড়ানো যা এখন পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীনে হেরিটেজ সৌধ যা বাদুড়দের বাসা আর পায়রাদের নিশ্চিত বিচরণ ক্ষেত্র।

পায়ের সমস্যা থাকলে বা বয়সজনিত সমস্যা থাকলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা বা সুড়ঙ্গের সিঁড়ি বেয়ে নামা আবার ওঠা বেশ কষ্টকর, পুরো খাড়াই পাথরের সিঁড়ি, দম হাল্কা হয়ে যায় ওঠানামা করতে, কিন্তু জাফরির কাজ, বিভিন্ন জায়গার স্থাপত্য ভীষণ মনোমুগ্ধকর । আমার যেহেতু তার আগেই আছাড় খেয়ে ব্যথা ছিল পায়ে, বেশ কষ্ট হয়েছে আর পুরো দুর্গটা ঘুরে দেখতে অন্ততঃ সকাল থেকে সন্ধে সময় তো লাগবেই, অনেকখানি ছড়ানো ইমারত।এই মাটি আর হলুদ ও গৈরিক রঙের বিন্ধ্যাচল পর্বতের বেলেপাথর ও ব্যাসল্ট দিয়ে তৈরী দুর্গ, যে পাথরে ধুলো বসেনা, মসৃণ পরিষ্কার, হাত ঘষলে হাত পরিষ্কারই থাকে কিন্তু বাদুড়দের ঝুলে থাকতে কোনো বাধা নেই, যেখানে তারা আছে সেখানেই চামসে গন্ধ আছে।

ভারতের সবচেয়ে সুন্দর কেল্লাগুলির মধ্যে অন্যতম। উরোয়াই গেট দিয়ে উঠলে জৈন ধর্মের দারুন নিদর্শন পাওয়া যায়। পাহাড়ের পাথর কেটে তীর্থঙ্কর এর মুর্তি আছে। মান সিং প্যালেস অবশ্যই দ্রষ্টব্য জায়গা। ২৫ টাকা টিকিটের দাম। এছাড়াও একটা মিউজিয়াম আছে। কেল্লার ওপর থেকে গোয়ালিওর শহর অপরূপ দেখায়। কেল্লার ওপর গুরুদুয়ারা আছে একটি যেটা শিখ ধর্মের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র। শূণ্য র সবচেয়ে প্রাচীন শিলালিপি এখানেই অবস্থিত। মধ্যপ্রদেশের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান এটি। হলুদ পাথরের ওপর নীল সবুজ টাইলস কেল্লার সুন্দরতা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করেছে। মান সিং প্যালেস এর হাতি ময়ূর সিংহর কারুকার্য দারুন।

এক সময় মোঘল সম্রাটের কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো এই মান সিং প্যালেস এর একাংশ। ঝাঁসির রানী এই কেল্লা থেকেই ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মান সিং প্যালেস এ ঝাঁক ঝাঁক বাদুড় বসে থাকতে দেখা যায়। এছাড়াও প্রচুর ময়ূর টিয়াপাখি আছে।

ঘুরে আসা যাক ইতিহাসের হাত ধরে সেই জায়গাগুলোতে। দীনদয়াল নগর থেকে অটো নিল দেড়শো টাকা গোয়ালিয়ার ফোর্ট, সেখানে আমরা গিয়ে নামলাম গুজারী মহলে। ওখান থেকে গাড়ি ভাড়া করা হল পাঁচশো টাকা দিয়ে একটা মারুতি ওমনি, সে আমাদের প্রথমে নিয়ে গেল ফোর্টের আরেকদিকে বাদল গেটে। বাদল গেটে ঢোকার মুখে দেখা হল এক রাজস্থানী লোকশিল্পীর সঙ্গে যে গেটের মুখে বসে তার গ্রামীণ যন্ত্রে বাজাচ্ছিলেন গান “উড় যা কালে কওয়া তেরে...কে ঘর আজা পরদেশী, কে তেরি মেরি এক জিন্দরী”, খুব শ্রুতিমধুর তার বাজনা, তন্ময় হয়ে আপনমনে বাজিয়ে চলেছেন তিনি তাঁর তারের যন্ত্রটিতে। আমরা দাঁড়িয়ে কিছুক্ষন শুনলাম তার বাজনা। বলল সে সওয়াই মাধোপুর থেকে এসেছে, যেদিন আমরা গেছিলাম তার আশেপাশেই ভিকি কৌশল আর ক্যাটরিনার বিয়ে হচ্ছিলো ওই জায়গায়, তাই জায়গাটার নামটা পরিচিত লাগলো।

এবারে এগোনো হল ফোর্টের দিকে, সামনেই সেই জায়গা যেখানে দাঁড়ালে গোটা গোয়ালিয়ার শহরটা নজরে আসে ওপর থেকে।

সাধারণভাবে সারা ভারতে এক অখণ্ড হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করাই ছিল হিন্দু-পাদ-পাদশাহীর লক্ষ্য। পেশোয়া পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর প্রথম বাজিরাও ছত্রপতি শাহুকে বুঝিয়েছিলেন যে, মুঘল সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য সুতরাং এই সুযোগকে কাজে লাগাতেই হবে, তখনই প্রথম বাজিরাও হিন্দু-পাদ-পাদশাহী বা হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

তবে এই আদর্শের প্রথম যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি হলেন মারাঠা বীর ছত্রপতি শিবাজী। স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনের জন্য রাজপুত, বুন্দেলা প্রভৃতি হিন্দু শক্তিগুলি প্রথম বাজিরাও এর পক্ষ গ্রহণ করেন।

পেশোয়ার হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনের স্লোগান দিলেও মুঘল সাম্রাজ্য দখল করার কোনো চেষ্টা করেননি। উপরন্তু তারা মুঘল সাম্রাজ্যের আনুগত্য মেনে নিয়েছিল।

গোয়ালিয়র রাজ্য ছিলো অর্ধ-স্বায়ত্তশাসিত একটি মারাঠা রাজ্য। বর্তমানে এই রাজ্যটির গুরুত্ব মারাঠা সাম্রাজ্যের উত্থান এবং মোগল সাম্রাজ্যের খন্ডীকরণ এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

রাজ্যটি হিন্দু মারাঠা সিন্ধিয়া রাজবংশের দ্বারা শাসিত হতো এবং এটি ছিল ব্রিটিশ ভারতের ২১ তোপ সেলামী রাজ্যগুলির একটি। রাজ্যটি পুরাতন শহর গোয়ালিয়রের নামে নামাঙ্কিত, যদিও শহরটি এই রাজ্যের রাজধানী ছিল না, তা সত্ত্বেও এখানে অবস্থিত দুর্গের ক্ষমতা ও ভৌগোলিক সুবিধাজনক অবস্থানের কারণে এই শহরটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মারাঠা সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে রাজার রাণোজী সিন্ধিয়া এই রাজ্যের পত্তন ঘটান। পেশোয়া প্রথম বাজিরাও উজ্জয়নী অঞ্চলে প্রশাসনিকভাবে শাসনকার্যে সুবিধার জন্য তার বিশ্বস্ত রাণোজী সিন্ধিয়া এবং তার সেনাপতি যশজী অরবিন্দকরকে দায়িত্ব দেন। রাণোজী সিন্ধিয়ার দেওয়ানী রামচন্দ্র বাবা শেনবী ছিলেন একজন ঐশ্বর্যবান ব্যক্তি, তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে চার-পাঁচ দশক ব্যয় করে উজ্জয়িনীতে অবস্থিত শ্রীমহাকালেশ্বর মন্দির সংস্কার করান।

১৭৬১ থেকে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গোয়ালিয়রে মহাদজী সিন্ধিয়ার শাসনকালে রাজ্যটি মধ্য ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী দেশীয় রাজ্যে পরিণত হয়। ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধের ফলে রাজ্যটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং একটি দেশীয় রাজ্যের পরিণত হয়। মধ্য ভারত এজেন্সির সর্ববৃহৎ দেশীয় রাজ্য ছিল একটি, যা গোয়ালিয়র রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে মধ্য ভারত এজেন্সি থেকে গোয়ালিয়র রেসিডেন্সিকে পৃথক করা হয় এবং সরাসরি ভারতের গভর্নর জেনারেল শাসিত একটি প্রদেশে পরিণত করা হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সিন্ধিয়া শাসকদের সিদ্ধান্তে একীভূতকরণের দলিল স্বাক্ষরিত করে এটি ভারতীয় অধিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বাধীন ভারতে এটি মধ্যভারত রাজ্যের অংশীভূত হয়।

রাজ্যটি ৬৪,৮৫৬ কিমি (২৫,০৪১ মা) ক্ষেত্রফল জুড়ে বিস্তৃত ছিল এবং দুটি বিভাগ তথা উত্তর দিকের গোয়ালিয়র বিভাগ এবং দক্ষিণ দিকে মালব বিভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তর দিকের গোয়ালিয়র বিভাগ ছিল ৪৪,০৮২ কিমি ২ (১৭,০২০ মা২) বিস্তৃত এবং ২৪°১০' - ২৬°৫২' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৪°৩৮' - ৭৯°০৮' পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে। এটির উত্তর উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত চম্বল নদী, যায় এটিকে রাজপুতানা এজেন্সির ঢোলপুর, কারাউলি ও জয়পুর রাজ্য থেকে; পূর্বদিকে যুক্তপ্রদেশের ব্রিটিশ জেলা জালৌন ও ঝাঁসি জেলা, মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলা; দক্ষিণ দিকে ভোপাল, খিলচীপুর ও রাজগড় রাজ্য, রাজপুতানার টঙ্ক রাজ্য; পশ্চিম দিকে রাজপুতানার টঙ্ক রাজ্য, ঝালাওয়াড় রাজ্য এবং কোটা রাজ্য থেকে পৃথক করেছে।

উজ্জয়নী শহরসহ মালব বিভাগ ছিল ২০,৭৭৪ কিমি (৮,০২১ মাইল) আয়তন বিশিষ্ট। এটি একাধিক বিচ্ছিন্ন জেলা নিয়ে গঠিত ছিল।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে তথ্য অনুযায়ী এই জেলা থেকে প্রাপ্ত করের পরিমাণ ছিল ১,৫০,০০,০০ ভারতীয় মুদ্রা। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের জনগণনা অনুসারে গোয়ালিয়র রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল ৪০,০৬,১৫৯ জন।

শাসকবর্গ: মারাঠা রাজবংশ এবং গোত্র মহারাষ্ট্র এবং অন্যান্য ভারতীয় রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। প্রধান গোত্র এবং তাদের বংশোদ্ভুত স্থানগুলোর অন্যতম হলো: শিন্দে বা সিন্ধিয়া: মধ্যপ্রদেশ গোয়ালিয়র এবং মহারাষ্ট্র–সাতারা। গোয়ালিয়র দেশীয় রাজ্যের শাসকগণ মহারাজা সিন্ধিয়া উপাধিতে ভূষিত হতেন।

ঐতিহাসিক ও আধুনিক শহর ভারতের মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়ার। মধ্যপ্রদেশের এই শহরকে বলা হয় "গেটওয়ে টু মধ্যপ্রদেশ।" দুর্গ, মন্দির, প্রাসাদ সম্বলিত মধ্যভারতের অন্যতম প্রাচীন এই শহরের গোয়ালিয়র দুর্গ খুবই প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি কিছু কাজে সেখানে যেতে হয়েছিল, তাই কিছুটা দেখা হল সেই শহর ও তার কিছু দর্শনীয়।

আসি গোয়ালিয়ার দুর্গের কথায়।এই ঐতিহাসিক গোয়ালিয়র দুর্গকে 'জিব্রাল্টার অফ ইন্ডিয়া' বলে কারণ দুর্গের প্রাচীরের ওপর থেকে গোটা গোয়ালিয়র শহরটি দৃশ্যমান। দুর্গটির রহস্য হল শহর থেকেও ৯১ মি. অধিক উচ্চে ৯ মি. উঁচু প্রাচীর ঘেরা ২.৮ কিমি. দীর্ঘ এবং ২০০ থেকে ৮০০ মি. প্রস্থের বেলেপাথরের খাড়া পাহাড়ে গোয়ালিয়র দুর্গ। সোমবার ছাড়া সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত দর্শন করা যায়। প্রতিরক্ষার দিক থেকে খুবই সুরক্ষিত ছিল এই দুর্গ। দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বে দুটি পথে দুর্গে প্রবেশ করা যায়। দক্ষিণ-পশ্চিমের পথে ৭-১৫ শতকের মধ্যে পাহাড় কেটে তৈরি ২২ জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি, রঙ-বেরঙের দেওয়াল চিত্রে জৈন মিথোলজি আকর্ষণ বাড়িয়েছে। ছটি শিলালিপির সঙ্গে এখানে মহাবীরের পিতা-মাতার মূর্তিও হয়েছে। পশ্চিমে গেটের কাছে পদ্মের ওপর দণ্ডায়মান ১৯টি উচ্চ ১৫ শতকের মূর্তি। তার মধ্যে ২০তম তীর্থঙ্কর আদিনাথ ও ১০ মি. উঁচু উপবিষ্ট ২২তম তীর্থঙ্কর নেমিনাথের মূর্তি দুটি অনবদ্য। দৈবজ্ঞানে পুজো করে ভক্তের দল। এ ছাড়া জীবজন্তু, স্বর্গের অপ্সরা মূর্ত হয়েছে দেওয়ালে। আর উত্তর-পূর্বে আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম হয়ে ১ কিমি. দীর্ঘ বন্ধুর পথ উঠেছে দুর্গের পাঁচটি গেট বা মহল পেরিয়ে দুর্গ। প্রথমটি ১৬৬০-এ ঔরঙ্গজেবের সম্মানে তৈরি আলমগীর গেট, দ্বিতীয়টি সমকালে তৈরি বাদলগড় বাদল সিংয়ের নামে নাম, তৃতীয়টি বানসুর বা আরচেরি গেট যা আজ লুপ্ত, চতুর্থ ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি গণেশ গেটের আকর্ষণ বহুবিধ। কবুতরখানা, সাধু গৃবালিপার ছোট মন্দির যেতে ৮৭৬-এ তৈরি চতুর্ভুজ বিষ্ণু মন্দিরের অবস্থান গণেশ গেটে। পঞ্চমটি ১৫১৬-এ মান সিংয়ের তৈরি হস্তী গেট। সেকালে রাজ পরিবারের যাতায়াতও ছিল হাতির পিঠে। হাতি চলে আজও যাত্রী নিয়ে এ পথে।

কথিত সাধু গৃবালিপার নাম থেকে শহরের নাম হয়েছে গবালিয়র। সাধু গৃবালিপার দয়ায় রাজা সুরজ সিং দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করলে সেই সাধুর নামানুসারে শহরের নাম রাখেন গোয়ালিয়র। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত সামন্তরাজা সূর্য সেন রোগমুক্ত হন সাধু গৃবালিপার মন্ত্রপূত সূর্য কুণ্ডের জলে। রোগমুক্তির পর নামেরও বদল ঘটান। সূর্য সেন হন সূর্য পাল, আর কুণ্ডর নাম হয় সুর্যকুণ্ড। সাধুরই ভবিষ্যদ্বাণী এই পাল রাজারা অজেয় থেকে রাজত্ব করবে গোয়ালিয়রে। সাধুর ইচ্ছায় গোপাচল পাহাড়ে গোয়ালিয়র দুর্গ গড়েন সূর্য পাল। এটা একটি মত। আবার প্রাচীন ঋষি গালব যিনি ছিলেন ঋষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য তাঁর তপোস্থলীও গোয়ালিয়ার।

আরেক মত বলছে গোয়ালাদের নিবাসস্থল থেকে গোয়ালিয়র নাম। ব্রিটিশের মুখে মুখে হয়েছে গোয়ালিয়র। আদতে গোপগিরি বা গোপাদ্রি গোপ সম্প্রদায় বা গোয়ালাদের আবাসভূমি। এই শহরের বেশিরভাগ অঞ্চল জুড়ে এদের বাস যাদের আজও প্রধান জীবিকা গো–মহিষ পালন, দুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর ব্যবসা, তাই সারাশহরে

ছড়ানো অজস্র ডেয়ারি।বিকেলে শহরের রাস্তায় দেখা যায় দুধের স্টীলের ক্যান হাতে মহিলারা চলেছেন দুধ সংগ্রহে, সেখানে আবার দাঁড়িয়ে কিছু সুখ-দুঃখের আলাপচারিতাও চলছে।এছাড়াও মধ্যপ্রদেশে যেহেতু ভারতের সর্বাধিক কলার উৎপাদন হয়, গুজরাটের সাথে সাথে, তাই এখানে কলা বেশ সস্তা। অন্যান্য ফল ও সব্জিও সুলভ এবং সস্তা, যেহেতু আশেপাশে প্রচুর স্থানীয় চাষিরা চাষ করেন সেইসব জিনিসের। লোকজন যথেষ্ট ভদ্র, অতিথিবৎসল, সাহায্য করতে তৎপর এবং সৎ। "সৎ" এই কারণেই বললাম বাড়ির সামনে রাস্তায় বড়ো বড়ো টয়োটা গাড়ি দাঁড় করানো রয়েছে সারাদিন রাত্রি ধরে, পশ্চিমবঙ্গে হলে তার অনেক কিছুই বা ক্ষেত্রবিশেষে গোটা গাড়িটাই লোপাট হয়ে যেত, এখানে কেউ চেয়েও দেখে না। দোকান ও তার জিনিসপত্র খোলা জায়গায় ফেলে রেখে মালিক অন্য কাজে গেলেও চুরি করেনা কেউ সেসব। বাড়ির একতলার বারান্দায় বসানো রয়েছে সেগুন কাঠের চেয়ার, বিশাল টেবিল, কাউচ, সেগুলোও অক্ষতই রয়েছে, সব বাড়ির ইলেকট্রিক মিটার বাড়ির বাইরে রাস্তার ওপরে, সেগুলোও ঠিকই আছে।

দুর্গই মূল আকর্ষণ গোয়ালিয়রের। কাছাওয়া রাজাদের হাতে গোয়ালিয়রের বাড়বাড়ন্ত। কাছাওয়া থেকে পরিহরদের দখলে যাওয়ার পরে ইলতুতমিস পরিহরদের হঠিয়ে গোয়ালিয়র দখল করেন। তোমররাজ মান সিংয়ের সময় সুবর্ণ যুগ আসে গোয়ালিয়রে। শেরশাহও আসেন গোয়ালিয়রে। গোয়ালিয়রে পরিহর, কাছাওয়া ও তোমর রাজারা রাজত্ব করে গেছেন। তাদের কীর্তিকলাপ তথা প্রাসাদ, মন্দির, নানান সৌধ গোয়ালিয়রের মুখ্য দ্রষ্টব্য।

মোগল সাম্রাজ্যের স্থপতি বাবরের মতে হিন্দুস্থানের উজ্জ্বল রত্ন গোয়ালিয়র দুর্গ। মোগল সম্রাট বাবর জয় করে নেন এই দুর্গ। আর ১৭৫৪-এ মোগলদের পতনের পর সিন্ধিয়া (মারাঠা) রাজাদের হাতে যায় গোয়ালিয়র। স্বাধীনতা উত্তরকালেও ভারতীয় রাজনীতিতে সিন্ধিয়া রাজবংশ খুবই সক্রিয় ছিল।

আওরঙ্গজেবের ভাই মুরাদ বখশ এবং ভাতিজা সুলাইমান শিকোহকেও দুর্গে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মনমন্দির প্রাসাদে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। সিপিহর শিকোহ ১৬৫৯ থেকে ১৬৭৫ সাল পর্যন্ত গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী ছিলেন। আওরঙ্গজেবের পুত্র, মুহাম্মদ সুলতান ১৬৬১ সালের জানুয়ারি থেকে ১৬৭২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দুর্গে বন্দী ছিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, গোহাদের রানা সর্দাররা গোয়ালিয়র কেল্লা দখল করে ।

দুর্গ রহস্য: গোয়ালিয়র শহরের গোপাঞ্চাল নামক একটি ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই দুর্গটি। এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটি অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। এই দুর্গের উচ্চতা প্রায় ৩৫০ ফুট।

অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত এই দুর্গটি ভারতের অন্যতম বৃহত্তম দুর্গ হিসাবে বিবেচিত হয়। এই দুর্গটি সূর্যসেন নামে একজন স্থানীয় সর্দার দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। তবে বহু ঐতিহাসিকবিদ এও দাবি জানান যে এই দুর্গটি থেকে বহু বছর ধরে পাল রাজবংশ, মুঘল রাজবংশ, ভীম সিং, মহারাজা বিরামদেব, রামদেব প্রভৃতি রাজ্য শাসন করেছিল।

দুর্গটি তিন বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই দুর্গের কাঠামোটি সুন্দর লাল পাথর দিয়ে তৈরি। এছাড়াও, এই দুর্গের স্থাপত্য খুব সুন্দর, দুর্গের দেয়ালগুলি সুন্দর নকশা এবং শিলালিপি দিয়ে সজ্জিত। এই কারণেই একে "ভারতের জিব্রাল্টার" বলা হয়। কারণ আরবি শব্দ জিব্রাল্টারের আক্ষরিক অর্থ হল তারিকের পাথর/শিলা/পাহাড়। এই দুর্গের স্থাপত্য খুবই সুন্দর। এছাড়াও, এর গঠন বেশ শক্তিশালী এবং চিত্তাকর্ষক। এই দুর্গের প্রধান ফটকটি এলিফ্যান্ট ব্রিজ নামে পরিচিত। এই ফটকটি সরাসরি মন মন্দির প্রাসাদের যেটা মানসিং তোমরের নামে তৈরী সেই দিকে নিয়ে যায়।

এই দুর্গের অভ্যন্তরে একটি পুকুর রয়েছে। স্থানীয় মানুষের ধারণা এই পুকুরের জল পান করলে নাকি দুরারোগ্য নিরাময় হয়ে যায়। একই ভাবে মানুষের ধারণা রয়েছে যে এই দুর্গের মধ্যে নাকি লুকিয়ে রয়েছে বহু ধন সম্পত্তি। যদি এর হদিস আজ অবধি কোনও ঐতিহাসিক বিদ দেননি।

এই দুর্গের অভ্যন্তরে অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে। এর ভিতরে রয়েছে বুদ্ধ-জৈন মন্দির, গুজারি মহল, মানসিংহ মহল, জাহাঙ্গীর মহল, করণ মহল, শাহ জাহান মহল প্রাসাদগুলি। বর্তমানে এটি এখন একটি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। এই দুর্গ পরিদর্শন ছাড়াও, গোয়ালিয়রের সংস্কৃতি এবং বিখ্যাত খাবার উপভোগ করতে পারেন। এই শহরটি তার হস্তশিল্পের জন্যও বিশ্বব্যাপী পরিচিত।

প্রেমের সৌধ: গোয়ালিয়র গেট দিয়ে দুর্গে ঢুকতেই বেলেপাথরের মিনারওয়ালা প্রেমের সৌধ গুজরি মহল। গুর্জর বংশীয় প্রিয়তমা মহিষী মৃগনয়নীর জন্য ১৫১০-এ মান সিংয়ের তৈরি স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সুন্দর। এ দুর্গের স্তম্ভের হলদে, সবুজ, নীলাভ রঙের সঙ্গে সোনালিতে বর্ণালি বেড়েছে। হাতি-মানুষ-হাঁস-তোতা-টিয়া-ফুল ও ফলের অলঙ্করণে। হস্তী গেট পেরোতেই কন্দধর্মী ৬ গম্বুজ শিরে মান সিং প্যালেস। এটিও তৈরি করেন মান সিং আর সংস্কার হয় ১৮৮১-তে। ডান্সিং হল ঘিরে ব্যালকনি-অঙ্গন। রঙ-বেরঙের টালি বসিয়ে জলসাগরের নানান নকশা ও পাথরের জাফরির কাজ অতুলনীয়। জনশ্রুতি, জাফরির অন্তরাল থেকে রানীরা গানের তালিম নিতেন। ছয় তলা প্রাসাদের দুটি তলা মাটির নিচে। সেখানে মান সিংয়ের গ্রীষ্মাবাস ছিল। আর ছিল ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কারাকক্ষ, ফাঁসিঘর, স্নানঘর। আওরঙ্গজেব, ভাই মুরাদকে বন্দি রেখে ডিসেম্বরে এখানেই হত্যা করেন। মাটির নিচের মহল দর্শনে দর্শনার্থীদের টর্চ সঙ্গে নেয়া ভালো। লাগোয়া বিক্রমাদিত্য প্যালেস মান সিংয়ের ছেলের নামে নাম। জনশ্রুতি আছে, কোহিনূর (হীরে) এখান থেকেই ভেট হিসেবে যায় হুমায়ুনের কাছে। অদূরে রাজা করণ সিংয়ের তৈরি দ্বিতল করণ মন্দির। কীর্তি মন্দির নামেও সমধিক খ্যাত। বিপরীতে ৮০ পিলারের কুণ্ড বা বাউড়ি।

পরাজয়ের পর আব্রু বাঁচাতে যেখানে জহর করতেন রানীরা। আবার এই জহর কুণ্ডের জলে একসময় গোটা শহরে জল সরবরাহ হত। ইলতুতমিসের দুর্গ দখলে এখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাণীদের জহরব্রত। হিন্দুর দুর্গে মুসলিম প্রাসাদ জাহাঙ্গীর মহল ও শাহজাহান মহলও হয়েছে মান মন্দিরের পেছনে।

শাশুড়ি-বউমার মন্দির: অদূরেই পুব দেয়ালে শাস আর বহু অর্থাৎ। শাশুড়ি ও বধূর পৃথক পৃথক মন্দির। জৈন বলে দ্বিমত থাকলেও আসলে হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর মন্দির। ১০৯৩-এ রাজা মহীপালের তৈরি মন্দিরে দেবতার

অবর্তমান হলেও কারুকার্য আজও দেখে নেয়া যায়। প্রবেশদ্বারের ওপরে বিষ্ণুর মূর্তিও রয়েছে। মন্দির সংলগ্ন চাতাল থেকে শহরও দৃশ্যমান। সব কটা মন্দিরই মুসলমান শাসকদের কোপে পড়েছে একসময়, তাই তাই বিগ্রহ লুপ্ত তাদের, স্থাপত্যগুলোতে চুনের জল লেপে নষ্ট করেছেন বর্বর মুসলমান শাসক সম্প্রদায়, পরে ব্রিটিশ আমলে আবার সেগুলো চেষ্টা হয়েছে পুনঃরুদ্ধারের, কিন্তু পুরোপুরি উদ্ধার হয়নি বিশেষ করে স্থাপত্যের মূর্তির মুখগুলো ভাঙা বেশিরভাগ জায়গায় তবু তাদের গঠনশৈলী আর সৌন্দর্য্য আজও চোখ টানে।

তেলি কা মন্দির: দুর্গের পশ্চিমে রয়েছে দ্রাবিড় ও আর্য স্থাপত্যে গড়া দুর্গের প্রাচীনতম তেলিদের তেলি-কা-মন্দির। বিষ্ণু উপাস্য দেবতা। ছাদটি দ্রাবিড়ীয় শৈলীতে অলঙ্কৃত, আর দেয়াল আর্য ভাস্কর্যের নিদর্শন। উপরে ৩৩ মিটার উঁচু গম্বুজ। দুর্গের মধ্যে উচ্চতম এই বিষ্ণু মন্দির।
গুরুদ্বার দাতা বন্দী ছোড়: তেলি কা মন্দিরের বিপরীতে ষষ্ঠ শিখগুরু হরগোবিন্দর স্মারকরূপে গড়া গুরুদ্বারে দাতা বন্দি ছোড় পবিত্র শিখ তীর্থ। মর্মরের গুরুদ্বারের শিরে সোনার পাতে মোড়া গম্বুজ।

গুরু হরগোবিন্দ, ২৪ জুন ১৬০৬-এ, ১১ বছর বয়সে, ষষ্ঠ শিখ গুরু হিসাবে মুকুট লাভ করেন। তার উত্তরাধিকারী অনুষ্ঠানে, তিনি দুটি তলোয়ার পরেন: একটি তার আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব (পিরি) এবং অন্যটি তার অস্থায়ী কর্তৃত্ব (মিরি) নির্দেশ করে। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক গুরু অর্জানের মৃত্যুদণ্ডের কারণে, গুরু হরগোবিন্দ প্রথম থেকেই মুঘল শাসনের একজন নিবেদিতপ্রাণ শত্রু ছিলেন। তিনি শিখদের নিজেদের অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করার পরামর্শ দেন। জাহাঙ্গীরের হাতে তার পিতার মৃত্যু তাকে শিখ সম্প্রদায়ের সামরিক মাত্রার উপর জোর দিতে প্ররোচিত করে। জাহাঙ্গীর ১৬০৯ সালে ১৪ বছর বয়সী গুরু হরগোবিন্দকে গোয়ালিয়র ফোর্টে জেলে পাঠিয়েছিলেন, এই অজুহাতে যে গুরু আরজানের উপর আরোপিত জরিমানা শিখ এবং গুরু হরগোবিন্দ পরিশোধ করেননি। বন্দী হিসেবে তিনি কত সময় কাটিয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। তাঁর মুক্তির বছরটি ১৬১১ বা ১৬১২ ছিল বলে মনে হয়, যখন গুরু হরগোবিন্দের বয়স ছিল প্রায় ১৬ বছর। ফার্সি রেকর্ড, যেমন দাবিস্তানই মাজাহিব থেকে জানা যায় তাকে বারো বছর জেলে রাখা হয়েছিল, যার মধ্যে ১৬১৭-১৬১৯ এরও বেশি সময় গোয়ালিয়রে ছিল, তারপরে জাহাঙ্গীরের দ্বারা তাকে এবং তার শিবিরকে মুসলিম সেনাবাহিনীর নজরদারিতে রাখা হয়েছিল। শিখ ঐতিহ্য অনুযায়ী, গুরু হরগোবিন্দ জেল দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন দিওয়ালির দিন। শিখ ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটিকে এখন বন্দি ছোড় দিবস উৎসব বলা হয়।

ষষ্ঠ শিখ গুরু হরগোবিন্দ সাহিবকে সম্রাট জাহাঙ্গীর গোয়ালিয়ার ফোর্টে আটকে রাখেন বন্দী করে প্রায় বারো বছর ধরে, তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় তাঁর সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকর্মের জন্য। যখন তাঁকে মুক্তি দেন সম্রাট জাহাঙ্গীর, হরগোবিন্দ সাহিব তখন তাঁর সাথে সম্রাটের কাছে আরো ৫২ জন হিন্দু রাজা যাঁদের বন্দী করে রেখেছিলেন গোয়ালিয়ার ফোর্টে তাঁদের মুক্তির জন্য আবেদন করেন। জাহাঙ্গীর আদেশ দেন যে যতজন গুরুর চাদরের আশ্রয় নেবেন তাঁদের সবাইকে মুক্তি দেওয়া হবে, ফলস্বরূপ দাতা বন্দী ছোড় নাম হয়। এই গুরুদ্বারা নির্মিত হয়েছে ১৯৭০ সালে যা শিখদের অতি পবিত্র তীর্থ।

গুরুদ্বারার পশ্চিমে সূর্যকুণ্ড। আরো পশ্চিমে সিন্ধিয়া স্কুল। আর রয়েছে গৃবালিপার মূর্তি, মসজিদ, ম্যাগাজিন, একখাম্বা তাল, রানী তাল, ছেদি তাল ছাড়াও নানান কিছু।

রেল স্টেশনের কাছে লস্করে মোতি মহলের বিপরীতে রয়েছে মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম। মুঘল, রাজপুত আর মারাঠা মুদ্রার উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ এখানে রয়েছে।

সময়ের অভাবে আমরা জয়বিলাস প্যালেস দেখে উঠতে পারিনি।

জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি
প্রবেশ পথের সামনে দুদিকে দুটো কামান

দুর্গের গায়ে খোদাই করা জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি
গেটের মুখ থেকে
দুর্গের অলিন্দে দাঁড়িয়ে গোয়ালিয়ার শহর

ওপর থেকে নীচের পথ

ছোট ছোট কুলুঙ্গী
জাফরি
ভেতরের কারুকার্য
খিলান

দূর থেকে দুর্গের একটা দিক
দুর্গের ওপর থেকে শহরের দৃশ্য
জহর কুন্ড
হামামখানা

শাস মন্দিরের সিঁড়ি
শাস মন্দির
শাসবহু মন্দিরের কারুকার্য
বহু মন্দির

তেলিকা মন্দির
বহু মন্দির
শাস মন্দির
শাস মন্দির

বিভিন্ন জৈনগুরুদের মূর্তি পাথরকেটে বানানো
৫৮ ফিট উঁচু ভগবান আদিনাথের মূর্তি
তেলিকা মন্দিরের স্তম্ভ প্রতিহার রাজাদের তৈরী

MAN MANDIR PALACE
BUILT
IN THE REIGN OF THE
RAJA MAN SINGH
A.D.1486-1516
कर्ण महल
KARAN MAHAL
KARAN MAHAL WAS CONSTRUCTED BY KIRTI SINGH 1480-1486 THE SECOND RULER OF TOMAR DYNASTY KIRTI-SINGH WAS ALSO KNOW AS KARAN SINGH HENCE THE NAME OF THE PALACE WITH FEATURED OF HINDU STYAL OF ARCHITECTURE IS TWO STORY AND RECTANGULAR THERE IS RECTANGULAR HALL BASED AS LARGE PILLAR IN THE MIDDLE OF THE PALACE THIS WAS PROBALY THE CORT OF THE KING THE WESTERN PART OF THE PALACE HAS A HAMAM AND THERE ARE STAIRE TO REACH THE SECOND STORY.
COMMISSIONER
ARCHAELOGY RECHIVES AND MUSEUMS
M.P. GOVT. BHOPAL
গুজারী মহল
জহর কুন্ড

দাতা বন্দি ছোড় গুরুদ্বারা

সুরজ কুন্ড

॥সমাপ্ত॥